INTERNATIONAL PEER-REVIEWED RESEARCH JOURNAL OF SATYA RANJAN COLLEGE (IPRJSRC)

A Peer-Reviewed Multidisciplinary Multilingual Research Journal

E-ISSN: _____ P-ISSN: _____

DOI: _____

Volume I, Issue I, November 2026, Page No: 01-07

Published by Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Website: https://srcjournal.org/

বিমল করের গল্পে মৃত্যুর অনুষঙ্গ ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা

Dr. Purnima Das

Assistant Professor, Dept. of Bengali, Satya Ranjan College, Kalain, Cachar, Assam, India

Abstract

Time, by its very nature, is characterised by turning at crossroads and taking new directions as it moves forward. In keeping with the dynamic movement of ever-flowing time, the moments of emergence and disappearance in human life take shape. In the context of Bengali literature, Bimal Kar and Jibanananda Das are two such artists who have explored significant turning points in their own distinctive ways. Both writers have drawn the special attention of readers through their individual literary journeys. Rather than surrendering themselves to the conventional traditions of imitation and emulation, they have created their own distinctive worlds in Bengali literature, shaped by their thoughts, consciousness and perceptions.

The experiences of these two writers, nurtured by their distinct spheres of life and individual sensibilities, can never be identical. Consequently, the dimensions of their respective worlds of consciousness have inevitably evolved differently. Nevertheless, the literary works of both Jibanananda Das and Bimal Kar share a significant thematic connection, namely, 'Death'. The mysterious allure of death has repeatedly resurfaced in various forms throughout the creative works of both writers. While one was deeply enveloped by the mystery of death, the other developed a profound fascination with it. Despite their differences in perception, we can discern a subtle point of convergence in the literary works of these two writers in their treatment of death. This convergence constitutes an important dimension of their respective literary philosophies.

Keywords: Death, Artist, Literature, Perception, Sensibility

জীবনানন্দ দাশের জীবনকালের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমির' ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এই হিসেবে ধরতে গেলে বিমল করের প্রথম গল্প যদি 'অম্বিকানাথের মৃত্যু' ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তবে বিমল করের লেখক সত্তা সার্বিক অর্থে তখনও বিকাশ লাভ করেনি। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ তাঁর সৃষ্টিকর্মের সর্বোচ্চ শিখরে তখন অবস্থানরত ছিলেন। তাঁর কাব্য-কবিতাকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে নানাভাবে বিভাজিত করা গেলেও মৃত্যুর আচ্ছন্নতাই তাঁর সব সৃষ্টিকর্মকে সর্বতোভাবে আলাদা বলে চিহ্নিত করে– লেখক বিমল কর ও এর ব্যতিক্রম নন। একজন কাব্য-কবিতার 'চিত্ররূপময়তায়' নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন আর অপরজন কথাসাহিত্যে শব্দের সারল্যে পাঠকের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় যে এই দুই শিল্পীর রচনাকর্ম কেন এভাবে মৃত্যুর দ্বারা প্রভাবিত।

আসলে দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত সময়ের ক্ষতকে বুকে ধারণ করে কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্য ও কবিতাকে ভাষা দেন। দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদাস্তু সমস্যা এক গভীর শূন্যতাবোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল কবিকে। অগণিত মানুষের মৃত্যুর সাক্ষী বহন করে কবি 'ক্লান্ত প্রাণ' তাই জীবনের স্থির প্রত্যয়ে নয় বরং মৃত্যুর শীতলতাই হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়ে অধিক আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ কবি মনে করেন অসুস্থ জীবনের অনিশ্চয়তা থেকে মৃত্যুর নিশ্চিত আশ্রয় মানুষের কাছে অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। অন্তত তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত ভাবনা এটাই দাবি করে —

"যক্ষার রোগীর মতো ধুঁকে মরে মানুষের মন! জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃত মরণ!"[১]

রবীন্দ্র সমসাময়িক হয়ে রবীন্দ্র প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তার কবিতার জগৎ। আলো-অন্ধকারের মহোময়তায় তৈরি তাঁর কবিতার দেহ, আর মৃত্যুর নিঃশব্দ পথই তাঁর কবিতা লেখার সহযাত্রী।

ষাটের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পে যে পালাবদলের সূচনা হয়েছিল তা মূলতঃ বিমলকরের গল্পের হাত ধরে। কারণ ছোটগল্প যে সচেতন লেখকের নিজেকে প্রকাশিত করার জায়গা– এই চিরন্তন সত্যকে স্বীকার করেই বিমল করের ছোটগল্পের জগৎ প্রতিষ্ঠিত। অতৃপ্ত জীবনের জিজ্ঞাসাকে রূপ দিতে গিয়েই গড়ে তোলেন তাঁর গল্পের জগৎ। গল্পের জাদুতে আচ্ছন্ন না হয়ে, তার মধ্যে মননকে, ও গভীরতা দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। ব্যক্তিমনের জটিলতা, ভিতর বাইরের যে যোগসূত্র, স্বপ্ন ও জাগরণে ব্যক্তিকে অদ্ভুতভাবে চালিত করে তা ছায়া ফেলে ব্যক্তির তথাকথিত সম্পর্কের পরিধিতে। আর তা থেকে সৃষ্টি হওয়া নিঃসঙ্গতা, অর্ন্তজীবনের বেদনা, অসহায়তাবোধ ও মৃত্যুচেতনা– বক্তব্য বিষয়ের এমন স্বাতন্ত্র্যতা বিমল করের গল্পে এক অনন্যমাত্রা যুগিয়েছে, যা কিছুতেই পূর্বতন ধারার অনুরনণ বলা যায় না। বিমল করের লেখক জীবনে আত্মপ্রকাশের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে শেষবধি কাল পর্যন্ত, চিন্তাধারা তথা জীবনদৃষ্টির বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি যথেষ্ট পরিণত হয়েছে তাঁর শিল্পী সত্তা। কিন্তু লক্ষণীয় যে তাঁর লেখক চরিত্র তথা শিল্পীমনের তেমন বড় মাপের কোনো রূপান্তর ঘটে নি। আসলে বিমল করের উপমা বাংলা সাহিত্য জগতে হঠাৎ করে জ্বলে ওঠা কোনো গ্রহের সহিত হয় না বরং ধারাবাহিকভাবে উজ্জ্বলতা বিকিরণকারী সেই নক্ষত্রের সঙ্গে হয় যে তার আলো দিয়ে শুধু নিজেকে প্রকাশিত করে তুলেনি, স্বচ্ছ করে তুলেছে তাঁর আশে পাশের সমস্ত কিছুকেই। তাঁর লিখা গল্পগুলি যেন মৃত্যুর উপলখণ্ডে দাঁড়িয়ে জীবনেরই জয়গান ঘোষিত করে। বিমল করের গল্পের পরতে পরতে যদিও মৃত্যু ভাবনা জড়িয়ে আছে। তথাপি তা আমদের কখনও দিগভ্রান্ত করে না বরং জীবনের সত্যানুসন্ধানের দিগনির্দেশক হয়ে পথ দেখায়। এই মৃত্যুভাবনা সর্বোতো ভাবেই তাঁর গল্পকে আলাদা চিহ্নিত করে।

বিমল করের লেখায় মৃত্যুর এত গভীর ও ব্যপ্ত রূপ দেখে স্বভাবতই মনে হয়– এ শুধু বাহ্যিক অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে না। কারণ আন্তরিক উপলব্ধির স্পর্শ ব্যতীত মৃত্যুর গভীরতার এমন পরিমাপ নির্ণয় লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠত না। লেখকের স্মৃতিকথায় আমরা দেখি নিঃসঙ্গ একাকিত্বে ঘেরা তাঁর শৈশব-কৈশোরের সেই দিনগুলো যখন তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এটা ছিল তাঁর মানসিকভাবে ভাঙা-গড়ার আরেক ইতিহাস। এছাড়াও পারিবারিক জীবনে দেখা কিছু মৃত্যু ঘটনা তাঁর মনে গভীরভাবে ছায়াপাত করেছিল যা তাঁর লেখাকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে বা কখনও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে-

> "আসলে কোনো ঘটনা যখন ঘটে তখন তা মনের মধ্যে কোথাও একটা দাগ রেখে যায়। যেমন কোনো আঘাতে একটা কাঁচ ভেঙে না গেলেও তাতে চিড় ধরে। এরকম ক্রমান্বয় আঘাতে অনেকগুলো ফাটলের সৃষ্টি হয় যা তার ভবিষ্যৎ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, আমার একবোন অনেক ছোটবেলায় মারা যায় – আমার চোখের সামনে। পরবর্তীকালে আমার

লেখায় যখন মৃত্যু বার বার ফিরে এসেছে – তখন আমার মনে হয়েছে কেন এমন হচ্ছে। অনেক ভেবে আমি বুঝতে পেরেছি, ছেলেবেলার সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এটা এসেছে।"[২]

বিমল করের মৃত্যুভাবনার বিক্ষিপ্ত চিন্তা-চেতনার স্রোত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গল্পে প্রকাশিত। বিমল কর মৃত্যুকে কখনও দেখেছেন প্রকৃতির মায়াবী স্নিগ্ধতায়, ভাগ্যের অমোঘ পরিণতিতে এবং মানুষের নিঃসঙ্গতায়। বিষন্নতাবোধ, শূণ্যতাবোধ ও সর্বোপরি মৃত্যুচিন্তা – বিমল করের গল্পে বরাবরই প্রিয় বিষয়। অন্ততপক্ষে 'অশ্বত্থ' গল্প তাই দাবী করে। ১৯৫৫ খ্রীঃ 'দেশ' পত্রিকার জন্য লেখা 'অশ্বত্থ' গল্পটিতে মানুষ ও প্রকৃতি হয়ে ওঠেছে একে অপরের পরিপূরক। সেখানে গল্পকার দেখিয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাই জীবন আর বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু। গল্পটি পাঠক মনে এক সুখ দুঃখের দোলা লাগায়। এই গল্পে বিমল কর, জীবনের দরজায় এনে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার ঘটিয়েছেন। দেখিয়েছেন অমোঘ নিয়তিই আড়াল থেকে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে চলে। অনিবার্য নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত শিল্পীর চেতনা ক্রমে পাঠক মনে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। 'অশ্বত্থ' গল্পের নায়িকা রেণু মধুপুরের মেয়ে। নিরিবিলি শান্ত পরিবেশই তার বরাবর পছন্দ। তাই বিয়ের পর অশ্বত্থের ছায়াঘেরা রিভারসাইড রোডের বাড়িটিই তার ভালো লেগেছিল। স্বামী নবনী অফিসে চলে গেলে রেণুর দিন কাটে প্রকৃতির অনুষঙ্গে। নবনী রেণুদের ঘরের উঠোন সংলগ্ন হয়ে আছে এক বিশালাকায় অশ্বত্থ গাছ। এই অশ্বত্থ রেণুর সমস্ত দিনের সঙ্গী। রেণুর ভাবতন্ময় মনের সাথে অশ্বত্থের এই যোগ যেন আজন্মের। আসলে প্রকৃতির সাথে মানুষের সংযোগ তো নিরবধি কালের। লেখক তাই বোঝাতে চেয়েছেন, জন্মান্তরের ব্যবধানেও বিনষ্ট হয় না মানুষ ও প্রকৃতির সংযোগ সেতুটি। রেণু কখনও ভালোবেসে স্নিগ্ধ মমতায় পাতার জঞ্জালকে কুড়িয়ে নিয়েছে উঠোন থেকে আবার কখনও অভিমান করে গালি দিয়েছে অশ্বত্থের এই জ্বালাতনকে। ক্রমে সে অনুভব করল–

"নিজের রক্তমাংস থেকে একটা সেই গাছ যদি হত – এমনি করেই জ্বালাত।"[৩]

রেণুর এই অনুভব আশঙ্কা হয়ে তারপর একদিন সত্যে পরিণত হল। এক হেমন্তের বিকেলে রেণু হাসপাতাল থেকে খোকা কোলে নিয়ে ফিরে এলো ।

রেণুর মনে প্রকৃতির এই নিঃশব্দ পদপাত গল্পে এক গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। যা থেকে নিয়তির অপ্রতিহত ধ্বনি ও মৃত্যুর ছায়াপাতা রেণুর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে ফেলে। রেণু বিরক্ত হয়, জ্বলে যায় অশ্বত্থের আবর্জনার জঞ্জাল দেখে। ক্রমে এক শঙ্কা তার মনে ঘণীভূত হয়ে ওঠে অশ্বত্থের অস্তিত্বকে ঘিরে–

"ওই শত্রু আমার সব নেবে।" [৪]

নিয়তির এই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বিমল করের 'অশ্বত্থ' গল্পের পরে 'নিষাদ' (১৯৫৮) গল্পেও উচ্চারিত হতে দেখা যায়। মানুষের ভাগ্য নিয়তির অদৃশ্য বন্ধন রজ্জুতে আবদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক পলায়নী বৃত্তি, মৃত্যু ও নিয়তির অমোঘ কার্যকারণের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার নানা পথ খুঁজে পেতে চেয়েছে– যা বিমল কর তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে বারবার প্রকাশিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মৃত্যু এমন অবধারিত যে তার কাছে নিঃশর্ত সমর্পণ ভিন্ন মানবজীবনের গত্যান্তর থাকতে পারে না। 'অশ্বত্থ' গল্পের রেণু ও ভেবেছিল রাক্ষসে অশ্বত্থের কালোছায়া থেকে দূরে সরে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, শিশুকে আলো হাওয়ায় মানুষ করে তুলবে। কিন্তু রেণুর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যু কেড়ে নেয় তার সযত্নে গড়া স্নেহের কোলটিকে। খালি হয়ে যায় রেণুর সমস্ত জগৎ অন্তর আত্মা। এক দুঃসহ বেদনার ভার রেণুর বুকে জমে থাকে। গল্পটি এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত– কিন্তু তাতে বিমল করের নিজস্বতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেত না। কারণ মৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়েও বিমল কর কখনও জীবনবোধের দিকটিকে অস্বীকার করতে পারেননি বলেই রেণুকে আবার এসে দাঁড়াতে হয় অশ্বত্থের তলায় যেখানে–

"অশ্বত্থের সেই ভারি কালো গুঁড়ির ফাঁটা, ঠুকরানো কঠিন দেহ কেমন এক জাদুতে খুলে গিয়ে খুব নরম এক হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল...।"[৫]

আসলে মৃত্যুর কাছে জীবন পরাজিত হলেও জীবনের দাবিগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে তখনও জীবনেরই জয়গান ঘোষিত করে। মৃত্যুর দর্পনে ধরিত্রী স্বরূপা হয়ে গাছের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় রেণুকে সঙ্গত কারণেই মনে হয় যেন জীবনানন্দ দাশের 'সেদিন এ ধরণীর' কবিতায়–

"মৃত্যুর অঙ্গার মথি স্তন তার ভিজে রসে উঠিয়াছে ভারি, উঠিয়াছে দূর্বাধানে শোভি,"[৬]

কবি ধরণীর মাতৃরূপের স্নেহ ও করুণাকে খুঁজে পেয়েছেন যা অসংখ্য বিষাদ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ও অপরাজিত। যুগের পর যুগ ধরে অসংখ্য ধ্বংস ও মৃত্যুর উপত্যকা পেরিয়ে সভ্যতার গতি তরতড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংস ও সৃষ্টির, বিষাদ ও আনন্দকে বুকে ধারণ করে পৃথিবী ক্লান্ত, কিন্তু যুগের ক্লান্তি তার সৃষ্টিশীলতা ঠেকাতে পারেনি ধ্বংসের তাণ্ডবের পথ অতিক্রম করে জীবনরসে সিক্ত করেছে তার সন্তানদের। নবজীবনের আগমনে কেটে গেছে মৃত্যুর ধূসরতা আর সজীব হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অপার মাতৃত্বের স্নেহশক্তি ও মমতা। জীবনানন্দ দাশ ও বিমল কর দুজনেরই লেখার পরিসর আলাদা হলেও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের অস্তিত্ব সন্ধানই ওদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই গল্পের শেষে রেণুকে দেখি–

"দুধ খাইয়ে, আর এক অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে খুব নিশ্চিন্ত মনে এবার ফিরেই যাচ্ছিল তার সংসারের কাজেই যেন।"[৭]

মননধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন সম্পর্কে স্থির প্রত্যয়ে বিশ্বাসী একমাত্র বিমল করই পারেন মৃত্যুচেতনার গভীরে গিয়ে জীবনবোধের এমন চিত্র তুলে আনতে।

বিমল করের গল্পে 'মৃত্যুর' ভূমিকা খুবই প্রবল। তাই 'মৃত্যু' তাঁর গল্পে শুধু একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্রের রূপকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কখনও। যেমন 'অপেক্ষা' গল্পে মৃত্যুর রহস্যময় যাতায়াত লক্ষ্য করা যায় একটি চিঠির ছদ্মবেশে। গল্পটি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত। সহকর্মী ভুবনের আকস্মিক মৃত্যু শিবতোষের মনের কোনো এক পৃষ্ঠাতে ভাঁজ ধরিয়ে দেয়। আসলে মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সঞ্চয়ে জীবনের অজস্র পৃষ্ঠা পূর্ণ হতে থাকে আজন্ম কাল অবধি। তার মধ্যে চিহ্নায়িত কোনো পৃষ্ঠা বিশেষ একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতাকে ধরে রাখে। তখন লক্ষ্য না করলেও পরে লক্ষ্য করা যায় ধারাবাহিক ব্যবহারে প্রত্যাহিকতার ফাঁকে তার প্রগাঢ় উপস্থিতি জীবনকে কখনও নিয়ন্ত্রিত করে নিয়ে যায় আরেক চেতনার জগতে। ভুবনের মৃত্যু শিবতোষকে ঠেলে দেয় কিছুটা এই রকম পরিস্থিতিতে। কবে যেন তার কাছে একটা চিঠি এসেছিল সেটাকে খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। কিন্তু খুব আবছা স্মৃতির অন্ধকার হাতড়ে চিঠি থেকে একজন ব্যক্তির আগমন বার্তার ইংগিতটিকে উদ্ধার করে শিবতোষ। শুরু হয় তার অপেক্ষার প্রহর গুণা। এই অনিবার্যতার সামনে পরিবার পরিজন সবই কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে তার কাছে। কারণ জাগতিক সমস্ত অনুভূতিকে চাপিয়ে মৃত্যুর আসন্ন উপস্থিতি শিবতোষকে বিব্রত করে তোলে । যেমন করে জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় তুলে ধরতে চেয়েছেন যৌবনের উন্মাদনাময় অধ্যায়ের চরম শিখরে পৌঁছেও মানুষকে জীবনের নশ্বরতার উপলব্ধি নিয়ে যায় এক গভীর শীতল মৃত্যুর উপত্যকায়। তাকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারে না মানুষ জীবনের সঙ্গে সমান ভাবে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অলক্ষ্য পদচারণা। যা কোনো বিশেষ মুহূর্তে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় মানুষের কাছে। তখন অভ্যস্ত জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ অর্থহীন হয়ে এক সীমাহীন শূন্যতায় পর্যবসিত হয় যেন–

"সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেওয়ালের মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ।"[৮]

- এই 'ধূসর মৃত্যুর মুখ' বারে বারে উঁকি মারে বিমল করের গল্পে। বিভ্রান্ত করে তুলে তাঁর সৃষ্টিকে, চেতনাকে, সৃষ্ট চরিত্রকে।

একই বছর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প 'উদ্বেগ'। 'অপেক্ষা' গল্পে বিমল কর মানুষের ব্যক্তি জীবনের গভীরে গিয়ে মৃত্যুর পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন। আর 'উদ্বেগ' গল্পে মৃত্যুর নিবাস কোনো ব্যক্তি নয় সমাজের বুকে।

'নিষাদ' গল্পে নিষাদ 'শীতের মাঠে'র গাছকাটা ও 'অপেক্ষা'র চিঠির পর মৃত্যু এসেছে চোরের হাতের সিঁদকাটির রূপকে 'উদ্বেগ' গল্পে । মৃত্যুর অদৃশ্য 'সিঁদকাটি' অলক্ষ্যে থেকে শহরের বুকে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে চলে। আর সেই ক্ষতের অবিরত ক্ষরণে জীবনের পূটভূমি কখন মৃত্যুর উপত্যকায় পর্যবসিত হয়ে যায়, তা শহরের বিত্তবান ও বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী মানুষদের ভাবনা চিন্তায় অনুপ্রবেশ করতে পারে না। মৃত মানুষগুলির অজ্ঞতা এবং তাদের প্রতি অন্যদের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে শিশির হতাশ হয়, পীড়িত হয়। তার এই হতাশা সমাজের বুকে জমে থাকা গ্লানিকেই স্পষ্ট করে এবং একই সময়ে নগরসভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার দিকটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। জীবনানন্দের ভাষায়–

"দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রাম পতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেওয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।"[৯]

সভ্যতার অগ্রগতির খাতিরে মানুষ নগরায়নের পক্ষপাতী আর সেই নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পুঁজিবাদ ও ক্ষমতালোভী নরপিশাচের মুনাফার সম্পর্ক। মানুষের জীবনের মূল্য যাদের কাছে কড়ির বিনিময়ে উৎসর্গ হয় তাদের লোভাতুর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবেকশূন্য মনবৃত্তির বিষবাষ্পে শুধু প্রকৃতি এবং সমাজই নয় মানবিকতাও আজ কলুষিত। বিমল করের 'দেওয়াল' কিংবা 'যদুবংশ' উপন্যাসে মূমূর্ষ সমাজের আরেক প্রতীকী রূপকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি এই গল্পে। জীবনানন্দ তাঁর কবিতাতে পৃথিবীর গভীরে নিমজ্জিত এক অসুখের কথা তুলে ধরেন –

"যাদের হৃদয়ে কোন প্রেম নেই- প্রীতি নেই–
করুনার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"[১০]

'উদ্বিগ্ন' গল্পের শিশিরকেই ঠিক এইরকম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পথ হাঁটতে হয়–

"রাজারামবাবু আরো দেদার ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হুকুম করবেন, তিনি চেয়ারম্যান। মুখার্জি সাহেব ইঁদুর মশা মাছি থেকে সাবধানে থাকতে বলবেন, কেননা তিনি হাকিম। শিশির কিছু বলতে পারবে না– কেন না প্রতিটি মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ও অস্থিরবোধ করছে। সে শুধু লজ্জিত হবে। অনুতপ্ত হবে।"[১১]

জীবনানন্দের মতো মৃত্যু চেতনা, বিষণ্ণতাবোধ ও সময়ের আঘাতে বিপর্যস্ত মানুষের ছবি বিমল করের গল্পে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহার: 'মৃত্যু' বলতে আমরা কি শুধু কায়িক বিনাশকে বুঝি– আসলে তা নয়, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয়ে ও আত্মবিনাশে কত সহস্র মরণের রাজ্য পেরিয়ে যাই আমরা প্রতিনিয়ত, আর একসময় এই পেরিয়ে যাওয়া টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলি অবসানের চরমমুহূর্তে এসে বিলীন হয়ে যায়। তাহলে কি মেনে নিতে হয় মৃত্যুই মানব জীবনের সবশেষ কথা। আসলে মানুষের হৃদয়ে যে মৃত্যু বাসা বাঁধে তাতেই মানুষ পীড়িত হয়, মৃত্যুতে নয়। কারণ ভয়ঙ্করতা মৃত্যুর মধ্যে নয়– যা আছে তা আত্মমগ্ন স্বার্থপরতাস্বরূপ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যে। একথা সত্য মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয় হলেও মৃত্যু ধারণাকে পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ পুনর্জীবন লাভ করতে পারে। বিমল কর তাঁর গল্প উপন্যাসের জগতে সেই মৃত সঞ্জীবনীর সন্ধান করে বেড়ান। আর জীবনানন্দ দাশের কবিতায় 'মৃত্যু' হল জীবনের পরম উপলব্ধি, যার মধ্য দিয়ে অনুভবের জগতকে গভীরভাবে স্পর্শ করেন কবি। পৃথিবীতে মারক ব্যাধির স্থবিরতা, তবুও বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচিয়ে রাখে। দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়কালের সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অভাব ও সর্বগ্রাসী লোভ ও স্বার্থপরতার বিষবাষ্পে কলুষিত পৃথিবীর করুন চেহারা কবিকে পৌঁছে দেয় এক 'বিপন্ন-বিস্ময়'-এর জগতে। মানবিক সম্পর্কের নৈতিক অবক্ষয়ে মানবসমাজ ও সভ্যতার গভীর সংকটের মুহূর্তে তিনি অনুভব করেন –

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন; মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।"[১২]

– কারণ মানুষ তখনও মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের স্বপ্ন দেখে, ব্যাধিকে ভুলে আরোগ্য কামনা করে। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার লাইনগুলো তাই এখানে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে–

"তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় – অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।"[১৩]

বিমল কর ও জীবনানন্দ দাশ দুজনের লেখায় মৃত্যু একটি অবধারিত স্থায়ী প্রসঙ্গ রূপে উঠে এসেছে এর মধ্যে মৃত্যু শুধুমাত্র জীবনের শেষ পরিণতি হিসেবে নয়, জীবনের অনিবার্যতা ও রহস্যময়তায় ঘেরা চেতনার প্রতীক। আসলে মৃত্যু কখনও জীবন থেকে আলাদা কোন বিষয় নয় বরং মৃত্যুর দর্পনে প্রতিবিম্বিত হয়ে জীবনের মূল্য মানবিক সম্পর্ক ও অস্তিত্বের অর্থ মানুষের কাছে আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনানন্দ দাসের কবিতায় মৃত্যু প্রকৃতি ও অস্তিত্বের গভীরতায় এক দার্শনিক চেতনার সৃষ্টি করে। সে দিক থেকে বিমল কর প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস্তব জীবন ও মানবিক সম্পর্কের নিবিড়তায় মৃত্যুকে উপস্থাপিত করেন। তবে দুজনেই মৃত্যুর শীতলতার মধ্যে জীবনের পরিসমাপ্তিকে দেখেননি, দেখেছেন জীবনের অস্তিত্বকে তাই জীবন ও মৃত্যু তাদের লেখায় বিপরীত অনুষঙ্গ হিসেবে আসেনি এসেছে গভীর সত্যের উপলব্ধিতে।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, জীবনানন্দ। 'জীবন' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। সিগনেট প্রেস, কল-২০, পৃ. ৫৮।
২. সুর, দাস সুমনা। 'সাক্ষাৎকার: বিমল কর', 'বিমল করের কথাসাহিত্য'। এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৩৮২।
৩. কর, বিমল। 'অশ্বত্থ', 'পঞ্চাশটি গল্প'। আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৯, ২০০৮, পৃ. ২০৬।
৪. তদেব, পৃ. ২০৯।
৫. তদেব, পৃ. ২১২
৬. দাশ, জীবনানন্দ। 'সেদিন এ ধরনীর', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ভারবি, কল-৭৩, ১৯৮৮, পৃ. ১৬।
৭. কর, বিমল। 'অশ্বত্থ', 'পঞ্চাশটি গল্প'। আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৯, ২০০৮, পৃ. ২১৩।

৮. দাশ, জীবনানন্দ। 'মৃত্যুর আগে', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ভারবি, কল-৭৩, ১৯৮৮, পৃ. ১৮।
৯. তদেব, 'পৃথিবী লোক', পৃ. ৮৪।
১০. তদেব, 'অদ্ভুত আঁধার এক', পৃ. ১৫২।
১১. কর, বিমল। 'উদ্বেগ', 'পঞ্চাশটি গল্প'। আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৯, ২০০৮, পৃ. ৩২০।
১২. দাশ, জীবনানন্দ। 'সুচেতনা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ভারবি, কল-৭৩, ১৯৮৮, পৃ. ৫৮।
১৩. তদেব, 'আট বছর আগের একদিন', পৃ. ১২।